সন্ত্রাসবাদ এবং ইসলাম

আবুসাইদ মাহফুজ

সাম্প্রতিককালের ঘটনাপ্রবাহে একজন বিবেকবান মানুষের মাথায় প্রশ্ন আসা খুবই স্বাভাবিক, শুধু স্বাভাবিকই নয় বলা যায় অবশ্যম্ভাবী যে, ইসলামটা আসলে কি? সন্ত্রাস এবং ইসলামের মধ্যে সম্পর্কই বা কি? কারো কারো মাথায় হয়তো আরো জটিলভাবে প্রশ্ন আসতে পারে যে, শুধু সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহই কেন। পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যায় যেখানে ইসলাম বা মুসলমান সেখানেই সমস্যা। ফিলিস্তিন, কাশ্মির, আফগানিস্তান, বসনিয়া, সুদান, পাকিস্তান, ইরান, যেখানেই তাকাই মুসলিম দেশ মানেই সমস্যা। তাহলে কি বলা যেতে পারে ইসলাম ধর্মটার সাথেই সমস্যাটা জড়িত? উপরন্তু যারা একটু প্রগতিশীলমনা তাদের কেউ যদি জিহাদ শব্দটির সাথে পরিচিত হয় তখন আরেকটু তালগোল পাকিয়ে যায় তার উপরে ব্যাপারটা আরো জটিল আকার ধারণ করতে পারে যদি কারো কাছে ইসলাম ধর্মের মূল গ্রন্থ কোরান থেকে কিছু অংশ ভুলভাবে উদ্ধৃত করা হয় যে এবং অপব্যাখ্যা করা হয় যে, কোরানে সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করা হয়েছে, তখন তো ইসলামকে একটি সন্ত্রাসবাদী দল বা মতাদর্শ হিসেবে চিন্তা করতে এক বিন্দুমাত্র ও সন্দেহ থাকার কথা নয়।

ব্যাপারটা এজন্য একটু জটিল বৈ কি। তাহলে কি সত্যি সত্যি ইসলাম একটি সন্ত্রাসবাদী ধর্ম? মুসলমানরা কি তাহলে আসলেই সন্ত্রাসী? আপনি যদি একজন মুসলমান হয়ে থাকেন তাহলে আবেগবশতঃ কথাটা আপনার খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু একজন ব্যাক্তি যিনি মুসলমান নন বা ইসলাম সম্পর্কে যাঁর জ্ঞান শুধু প্রচার মাধ্যমের মধ্যে সীমিত তার কাছে তো খারাপ লাগার কথা নয়, এমনকি তারপক্ষে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে মনে করা অসম্ভব কিছুও নয়।

আজকের এই নিবন্ধে উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে সঠিক তথ্য পর্যালোচনার মাধ্যমে সত্য এবং বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা হবে।

ইসলাম অর্থ কি?

যে কোন বস্তু বা বিষয়ের নামটা সাধারণতঃ ঐ বিষয়ের অন্তঃনিহিত দর্শন বা লক্ষ্য উদ্দ্যেশ্যের তাৎপর্য বহন করে। একথার অর্থ এই নয় যে, কোন সংগঠন বা ব্যাক্তি নামের বিপরীতে কোন কাজ করেননা। বরং উপরোক্ত কথায় এটাই বুঝানো হয়েছে যে, নাম হলো **সাধারণত** কোন ব্যাক্তি বা সংগঠনের অভ্যন্তরের প্রতিচ্ছবি। মনে করুন কোন সংগঠনের নামের সাথে কম্প্যুটার জড়িত থাকে এর স্বাভাবিক অর্থ হলো ঐ সংগঠনটির কার্যক্রম কম্প্যুটারের সাথে জড়িত, কোন সংগঠনের নাম যদি সংস্কৃতিক হয় তাতে মনে করা যেতে পারে যে ঐ সংগঠনটি সংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত।

ইসলাম শব্দের অর্থ কি? ইসলাম আরবী শব্দ। ইসলাম শব্দের ধাতুগত মুল শব্দ হলো 'সলম'। আরবী ভাষায় যবর এবং যের এর পার্থক্যের কারণে এই শব্দটির উচ্চারণ সিলমুন বা সালমুন দুটোই হতে পারে। সিন অক্ষরের নীচে যের দিয়ে অর্থাৎ সিলমুন পড়লে এর অর্থ দাঁড়ায় আত্মসমর্পণ আর সিন অক্ষরের উপর যবর দিয়ে অর্থাৎ সালমুন পড়লে এর অর্থ দাঁড়ায় শান্তি। অর্থাৎ কথাটাকে স্পষ্ট করে বলতে হয় ইসলাম শব্দটির মৌলিক অর্থ হলো আত্মসমর্পন এবং শান্তি। ইসলামী চিন্তাবিদরা কথাটার ব্যাখ্যা এভাবে দেন যে, ইসলাম অর্থ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করা আর আত্মসমর্পন করার মাধ্যমেই মানব জীবনের শান্তি নিহিত রয়েছে। এটাই মূলতঃ এক কথায় ইসলামের অন্ত ঃনহিত অর্থ। আত্মসমর্পন কথাটাকে আরেকটু ব্যাখা করতে গেলে বলা যায় সাধারণত মানুষের মধ্যে একটা অহংবোধ বা আমিত্ব থাকে সেই অহংবোধ বা আমিত্বকে জলাঞ্জলী দিয়ে নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছার উপর সমর্পন করা।

পবিত্র কোরআনে কথাটার ভাবার্থ এভাবে ব্যাক্ত করা হয়েছেঃ "নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার ত্যাগ (ও কোরবানী), আমার জীবন এবং মৃত্যু (সব কিছু) আল্লাহর জন্য সমর্পিত।" (আল কোরআন ৬ঃ১৬২)।

আল্লাহর জন্য সমর্পন করার মূল অর্থ হলো, আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণে নিবেদিত করা। হাদিস শরীফে কথাটাকে এভাবে বর্ণণা করা হয়েছে, "মানুষের জন্য তাই পছন্দ কর যা তুমি তোমার নিজের জন্য পছন্দ কর এতেই তুমি প্রকৃতপক্ষে একজন ঈমানদার হতে পারবে।"

বিষয়টাকে স্পষ্ট করার জন্য উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে বৌদ্ধ বা হিন্দু ধর্মে যে 'নির্বাণ' কে পরম শান্তি বলা হয়েছে (নির্বানং পরমং সুখং), সুফিবাদের ভাষায় সেটাকেই 'ফানা ফিল্লাহ' বলা হয়েছে। যেটাকে চীনের 'তাও' ধর্মে 'উ চী' হিসেবে এবং

কনফুসিয়াস মতবাদে যেটাকে 'সু' বা পরার্থবাদ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে সেটাই মূলতঃ পরিস্ফুট হয়েছে আল্লাহর কাছে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে।

পবিত্র কোরানে বলা হয়েছেঃ "ঐ ব্যাক্তির কথার চে' আর কার কথা উত্তম হতে পারে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং সৎ কাজ করে আর ঘোষনা দেয় যে আমি একজন মুসলমান" (আল কোরআন ৪১ঃ৩৩)। কোরআনের উপরোক্ত আয়াতের দৃষ্টিতে আল্লাহর দিকে ডাকা এবং সৎ কাজ করা হলো একজন মুসলমানের বৈশিষ্ট্য। কোরআনের পর ইসলামের দ্বিতীয় পবিত্র গ্রন্থ হলো হাদিস। হাদিস হলো মূলতঃ নবী মুহম্মদ (সঃ) এর কথা, কাজ বা স্বীকৃতি। মুসলমান এর সংজ্ঞায় হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, "মুসলিম হলো সে ব্যাক্তি যার কথা এবং হাত (কর্ম) দ্বারা অন্য মুসলমান প্রশান্তি লাভ করে"। (তিরমিযি, নাসাঈ, দ্রষ্টব্যঃ মিশকাত ১ম খন্ড কিতাবুল ঈমান ৩৩) অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, "ঐ ব্যাক্তি মুসলমান হতে পারেনা যে নিজে পেট পুরে অথচ তার প্রতিবেশী অনাহারে দিন কাটায়"।

ঈমান এবং সৎকাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িতঃ

একজন ব্যাক্তি মুসলমান হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম শর্ত হলো ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা। যে ব্যাক্তি এই বিশ্বাস স্থাপন করে তাকে বলা হয় মুমিন। পবিত্র কোরআনের অধিকাংশ স্থানে যেখানেই ঈমান সম্পর্কে আলোচনা এসেছে সাথে সাথেই সৎকাজের আদেশ দেয়া হয়েছে। ঈমান সম্পর্কিত পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো পর্যবেক্ষণ করলে এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে ঈমান এবং সৎ কাজ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমনকি কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদের দৃষ্টিতে সৎকাজহীন ঈমানের কোন মূল্য নেই। অন্য অর্থে বলা যায় ঈমান বা ইসলাম হলো মূলতঃ সৎকাজ করা।

তাহলে সমস্যাটা কোথায়? ইসলামকে কেন সন্ত্রাসবাদের সাথে সংযুক্ত করা হয়। এ প্রেক্ষিতে আজকের নিবন্ধে কয়েকটি বিতর্কিত বা ভুল ব্যাখ্যাকৃত বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। বিষয়গুলোর একটি হলো জিহাদ। জিহাদ শব্দটাকে দু'দিক থেকে ভুল বুঝা হয়েছে বা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যারা জিহাদকে ইতিবাচকভাবে নিয়েছেন তাদের অনেকেই একদিকে যেমন জিহাদকে বুঝতে ভুল করেছেন অপরদিকে যারা ইসলাম সম্পর্কে বুঝতে ভুল করেছেন বা যে কোন কারণবশতঃ ইসলামকে অপছন্দ করেন তারাও এই জিহাদকে ভুলভাবে বুঝেছেন।

জিহাদ কি? এবং জিহাদের সাথে সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক কি ঃ

জিহাদ আরবী শব্দ। জিহাদের আরবী ধাতুগত আরবী শব্দ হলো 'জহদ' বা 'জাহদ' যার অর্থ হলো চেষ্টা করা, কোশেশ করা। সেই জাহদ বা জহদ থেকে উদ্গত এই জিহাদের মূল অর্থ হলো ইসলামের শিক্ষা বা আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করা কাজ করা। জিহাদ অন্য অর্থে আত্মশুদ্ধির জন্যও ব্যাবহৃত হয়ে থাকে হাদীস শরীফে বলা হয়েছেঃ "কঠিনতম জিহাদ হলো নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা।"

পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ "যে ব্যাক্তি জিহাদ করে সে ব্যাক্তি মূলতঃ নিজের আত্মার উন্নয়নের জন্যই জিহাদ করে"। (আল কোরআন ২৯ঃ৬)

জিহাদের সাথে লড়াই, মারামারি বা ঝগড়া ফাসাদের কোনই সম্পর্ক নাই। সুতরাং আপনি যদি ইসলামকে ভালবাসেন কিংবা ঘৃণা করেন, বা যেই হোননা কেন, আপনার জন্য একথা স্পষ্টভাবে জানা থাকা দরকার যে জিহাদ শব্দটা শুনলে কারো মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি বা কোনপ্রকার গাত্রদাহের কোনই কারণ নাই। জিহাদের সাথে সন্ত্রাসের কোনই সম্পর্ক নাই। জিহাদের মধ্যে কোন উত্তেজনার কিছুই নেই।

ক্বিতাল কি? ক্বিতালের সাথে ইসলামের সম্পর্কঃ

হ্যাঁ, ইসলামী পরিভাষায় অন্য একটি শব্দ রয়েছে তা হলো ক্বিতাল। ক্বিতাল শব্দের অর্থ হলো যুদ্ধ করা, জীবনহীন করা কিংবা মৃত্যুদন্ড দেয়া।

এই কিতাল শব্দ নিয়ে এবার আমরা আলোচনায় আসবো। দেখা যাক একটা জীবনকে জীবনহীন করার ব্যাপারে ইসলামী শরীয়ার মূল উৎস পবিত্র কোরান কি বলছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ "কোন জীবনকে জীবনহীন করোনা যা কিনা আল্লাহ পাক হারাম করেছেন। যদি না ঐ জীবন জীবনহীনতা বা মৃত্যুদন্ডের প্রাপ্য হয়" (দ্রষ্টব্য আলকোরআন ৬ঃ১৫১; ১৭ঃ৩৩; ২৫ঃ৬৮) কোরআনের ৩

স্থানে বর্ণিত উপরোক্ত বক্তব্যে একথাই স্পষ্ট যে, একজন ব্যাক্তি যদি মৃত্যুদন্ডের বা মৃত্যবরণ করার প্রাপ্য না হয় তাকে মৃত্যুদন্ড দিতে ইসলামের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অন্য অর্থে হ্যাঁ, একজন ব্যাক্তি যদি তার কৃতকর্মের কারণে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্য হয় সেক্ষেত্রে ইসলাম মৃত্যুদন্ড দেয়ার পক্ষপাতি। যদি কোন ব্যাক্তি অন্যায়ভাবে অন্য ব্যাক্তিকে হত্যা করে এক্ষেত্রে হত্যাকারিকে মৃত্যদন্ড দেয়ার বিধান ইসলামী পরিভাষায় রয়েছে সে মৃত্যুদন্ডকে বলা হয় কিসাস। এই কিসাস সম্পর্কে কোরআনের ঘোষনা হচ্ছে, "হে বুদ্ধিমানগন, কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।" (আলকোরআন ২ঃ১৭৯)। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোরআনের দর্শন হলো একজন অন্যায়কারীকে শাস্তি দিলে বাকি অন্যায়কারীরা সাবধান হয়ে আর অন্যায় করবেনা। সুতরাং একজন খুনীকে মৃত্যুদন্ড দিলে খুন কমে যাবে।

কথাটা স্পষ্ট করে বলতে হলে বলা যায় যে, ইসলাম শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড দেয়ার বিরুদ্ধে নয়। যদি কোন লোক সঠিক বিচারে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত হয় তবে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া যেতে পারে। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে মৃত্যুদন্ড দেয়াতে আপাতত যদিও একটি প্রাণ চলে যাচ্ছে, কিন্তু তাতে বাকী অনেকগুলো প্রাণ বেঁচে যাকে। অপরদিকে সঠিক বিচারের বাইরে কোন জীবনকে জীবনহীন করার ব্যাপারে ইসলামের কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

এবার আলোচনায় আসা যাক যদি ক্বিতাল শব্দটাকে যুদ্ধ বা লড়াই অর্থে ব্যাবহার করা হয়। দেখা যাক এক্ষেত্রে কোরআনের বক্তব্য কি? পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "তোমাদের উপর যুদ্ধকে ফরজ করে দেয়া হয়েছে, যদিও এটা তোমাদের জন্য অপছন্দনীয় কাজ।" (আল কোরআন ২ঃ২১৬)। এখন প্রশ্ন হলো কাজটা যদি অপছন্দনীয়ই হবে তাহলে আবার ফরজ করা হলো কেন? কেন যুদ্ধকে ফরজ করে দেয়া হয়েছে অপছন্দনীয় কাজ মনে করার পরও। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, "হায় তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে কেন যুদ্ধ করছোনা! অথচ, এই সমস্ত (নিপীড়িত, নির্যাতিতরা চিৎকার করে) বলছে, ও খোদা! আমাদেরকে এই স্থান থেকে নিষ্কৃতি দাও এখানকার মানুষগুলো যে বড়ই অত্যাচারী!" (আল কোরআন, ৪ঃ৭৫)

উপরোক্ত আয়াত থেকে এটা খুবই স্পষ্ট যে, নির্যাতিত মানুষের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করার জন্যই ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। যুদ্ধ বিগ্রহ খুব শখের বা মজার জিনিস নয়, কোরআন সেটাই বলেছে। অর্থাৎ বাধ্য হয়েই যুদ্ধের দিকে যেতে হচ্ছে। অত্যাচারী, জালিম শোষকগোষ্ঠী যখন নিরীহ মানুষের প্রতি তাদের হিংস্র থাবা বাড়িয়ে দেয় তখন তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাই ইসলামের নির্দেশ। কোরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে এ জন্য যে, তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে।" (আল কোরআন ২২ঃ৩৯)। সম্মানিত পাঠক, এখানে আরো একটা সুক্ষ ব্যাপার লক্ষ্যণীয় যে, অত্যাচারী নিপীড়িত মানুষকে অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য মুমিনদের উপর যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করা হয়েছে অথচ মুসলমানদের নিজেদের উপর যখন অত্যাচার করা হয়েছে তখন যুদ্ধের জন্য শুধু অনুমতি দেয়া হয়েছে। অবশ্যম্ভাবী করা হয়নি। যুদ্ধকে উৎসাহিত বা অনুমোদন দেয়ার অন্যতম আরো কারণের মধ্যে রয়েছে ফিতনা বা সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে এভাবে, "তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও সমাজ থেকে ফিতনা বা কলুষতা দূর হওয়া পর্যন্ত।" (আল কোরআন ২ঃ১৯৩; ৮ঃ৩৯)।

সমাজে যে সমস্যা আছে তাতো আমরা সবাই জানি। এবং এক শ্রেণীর হিংস্র মানুষ নামের অমানুষ আছে যারা নিজেদের স্বার্থে সমাজে ফিতনা সৃষ্টি করে সেটাও আমরা জানি। ঐ সমস্ত কলুষতা দূরীকরনের জন্য কিছু লোককে তো এগিয়ে আসতে হবে তাই নয় কি? কে হবে ঐ সমস্ত বীর পুরুষ? ইসলাম মুসলমানদেরকেই নির্দেশ দিচ্ছে ঐ সামাজিক সমস্যা দূরীকরনে এগিয়ে আসার জন্য। সুরা বাকারা এবং সুরা আনফালে ২ঃ১৯৩, ৮ঃ৩৯ এ বিষয়েই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনায় যুদ্ধ, শান্তি, শাস্তি বিধান সম্পর্কে কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট হবার কথা। ইসলাম সন্ত্রাসকে কোন প্রকার সমর্থন বা প্রশ্রয় দেয়না তবে ইসলাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের শুধু পক্ষেই নয় এটা ইসলামের নির্দেশ।

মুসলিম বিশ্বে এত সমস্যা কেন?

এ প্রশ্নটা খুবই জটিল। সত্যিই, বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, দূর প্রাচ্য বা পৃথিবীর অন্য যে কোন অংশের তুলনায় মুসলিম বিশ্বেই সমস্যা সবচে' বেশী। এই জটিল প্রশ্নের আলোচনায় যাওয়ার আগে পাঠকদেরকে অন্ততঃ দুটো বিষয়ে মনযোগ আকর্ষণ করবো। (১)মুসলমান বা ইসলাম বলতে আসলে কি বুঝায় বা অন্য অর্থে সত্যিকারভাবে মুসলমান কারা এবং তাদের মধ্যে আসলে সন্ত্রাসধর্মী সমস্যা আছে কিনা। (২) বর্তমান বিশ্বের যে সমস্ত সমস্যা মুসলমানদেরকে নিয়ে বিরাজমান ঐ সমস্ত সমস্যার পেছনে কলকাঠি কারা নাড়ছেন বা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরা ঐসব সমস্যার জন্য দায়ী কিনা।

(১) সত্যিকার মুসলমান বা ইসলামের সত্যিকার প্রতিনিধি কারা ঃ

অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সাদামাটাভাবে ইসলামের সংজ্ঞা হলো ইসলামের ৫টি স্তম্ভ (ক)ঈমান (খ) নামাজ (গ)রোজা (ঘ)হজ্ব ও (ঙ)যাকাত

একজন ব্যাক্তির মুসলমান হবার সাথে পৈত্রিক নাম, বংশ, জন্মস্থান, মুখাবয়ব শারিরীক প্রতিচ্ছবি, বেশভুষা মৌলিক বিষয় নয়। আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হবে কারো নাম আহমদ, তাসলিমা, মুহম্মাদ বা আবেদ খান হলেই যে তিনি মুসলমান হবেন এমনটি নয়। শুধু অতিত ইতিহাসে নয় বর্তমানেও আরব বিশ্বে অনেক অমুসলমানের আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান জাতীয় মুসলিম নাম রয়েছে। আরবী নাম দেখলেই সেটা ইসলামিক বা ভাল নাম এমনতর মানষিকতা অনুন্নত মেধার স্বাক্ষর। ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারেক আজিজের নাম শুনতে তো একজন মুসলমানের নামই মনে হয় অথচ তিনিএকজন খৃষ্টান। আসাদ না শুনলে ইসলামিক মনে হয়, আসাদ অর্থ হলো সিংহ। নাম নিয়ে আলোচনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হলো কোন বিষয়ে অহেতুক মোহাব্বতটা ক্ষতিকর। যেমনিভাবে লম্বা দাড়ি কিংবা আজানুলম্বিত জুব্বা থাকলে থাকলেই একজন ব্যাক্তি মুসলমান বা মুসলমানদের প্রতিনিধত্ব করেন না। যদি তা হতো তাহলে শিখরা হতো সবচে' বড় মুসলমান। আরব বিশ্বে খৃস্টানরাও লম্বা জুব্বা পরেন। একথা দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্য যে, উপরোক্ত মন্তব্যে অনেক মুসলমানই আহত কিংবা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে পারেন তারপরও একথা মানতে হবে যে উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট না থাকার কারণেই শুধুমাত্র আবেগতাড়িত হয়ে আমরা অনেকগুলো কাজ করে থাকি পরিণামে তার দায় দায়িত্ব ইসলামকে বহন করতে হয়।

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান সমস্যা আলোচনা করতে একথা বলতেই হবে যে, আমাদেরকে সমস্যার গোড়ায় যেতে হবে। আবেগ বর্জন করতে হবে। একজন ব্যাক্তিকে দেখতে বুজুর্গ মনে হলেই যে তিনি ইসলামী নেতৃত্বের জন্য সবচে' যোগ্য ব্যাক্তি এ ধরনের আবেগপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করতে হবে। এসব নেতৃত্বের অনেকে প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে ভালবাসেননা। আবার কেউ কেউ আছেন ইসলামকে ভালবাসেন ঠিকই এবং ব্যাক্তিগতভাবে একজন ভাল মুসলমানও, তিনি ইসলামী আহকামসমূহ পালনও করেন অথচ বার বার ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে মুসলমান সমাজের ক্ষতি করছেন। ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে ভুল ব্যাখ্যার সুযোগ দিচ্ছেন। এসমস্ত ব্যাক্তিও অজ্ঞতার কারণে মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব দেয়ার অধিকার রাখেননা।

শুধু নেতৃত্বের ক্ষেত্রেই নয়। এ কথাও আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, মুসলমান হিসেবে আমরা তখনই দাবী করার অধিকার রাখি যখন আমরা ইসলামের অনুশাষন মেনে চলবো। বিশ্ব বিখ্যাত সাবেক পপ সংগীত শিল্পী কেটস স্টিভেনস বর্তমানে ইসলামগ্রহনকারী ইউসুফ ইসলাম একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "আমার ভাগ্য ভাল যে, আমি ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি মুসলমানদেরকে দেখার আগে। মুসলমানদের যে করুণ অবস্থা এতে আমি যদি ইসলাম সম্পর্কে পড়ার আগে মুসলমানদেরকে দেখতাম তাহলে হয়তোবা ইসলাম গ্রহন করতাম না।"

বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম **দেশগুলোর মানুষের মধ্যে** আসলেই কিছু মৌলিক সমস্যা রয়েছে। ব্যাপারটা আসলে ধর্মীয় বা আদর্শিক নয় বরং ভৌগলিক। যেমন স্বভাবতই উপমহাদেশের মানুষগুলো বেশ আবেগপ্রবণ। আবেগপ্রবণতা, অদূরদর্শীতা, পরিণাম না ভেবে গরম মাথায় ঝাপিয়ে পড়া এসব। এ রোগটা উপমহাদেশের যে কোন ধর্মাবলম্বীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মুসলমান, হিন্দু খৃষ্টান, এমনকি নাস্তিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এই কারনে বাবরী মসজিদ নিয়ে এত হানাহানি, গুজরাটে হাজার হাজার মুসলমানের উপর হামলা। কাশ্মিরে সমস্যা। পাকিস্তানে গন্ডগোল। একই কারণে আমাদের বুদ্ধিজীবি সমাজের মধ্যে এত সমস্যা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে এই দুঃখজনক পরিস্থিতি।

পক্ষান্তরে পশ্চিমা জগতের মানুষের একটা সহজাত প্রবণতা হলো অন্যের কথা শোনা। মতবিরোধ করতে হলে বুদ্ধিমত্তার সাথে মতবিরোধ করা, ধৈর্য্য ধরা। এই নিবন্ধের পাঠকদের যাদের পশ্চিমা জগৎ সম্পর্কে ধারনা আছে তারা একটা কৌতুকের সাথে একমত হবেন যে, "আপনি যদি পশ্চিমা জগতে কারো কোন ক্ষতি করেন এতে তারা যদি আপনার উপর প্রচন্ডভাবে ক্ষুব্ধ ও হয় তারপর ও হাসবে, এবং বলবে ÓIt's OK, It's OK, don't worry" আপনি হয়তো আস্বস্ত হবেন এই ভেবে যে, যাক ঝামেলাটা চুকে গেল। আর আবেগাপ্লুত হয়ে ভাববেন, আহা এই পশ্চিমারা কত ভাল মানুষ। কিন্তু পরদিনই আপনি টের পাবেন যে আপনার বিরুদ্ধে মামলা (স্যু) করা হয়েছে। ব্যাপারটা এমন নয় যে, তারা ভাল কিংবা খারাপ মানুষ এটা বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বরং এখানে মূল বক্তব্য হলো পশ্চিমারা ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে পক্ষান্তরে এসিয়ানরা উত্তেজনাপুর্ণ পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেন না।

আগেই যেমন বলেছি আসলে ব্যাপারটা ভৌগলিক। অর্থাৎ এমন আচরণ আপনি পাবেন, খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু কিংবা নাস্তিক সবার মধ্যেই। শুধু তাই নয়, আপনি নিশ্চয়ই একজন বাংলাদেশী বা বাংগালী (যেহেতু বাংলা পড়ছেন সেজন্য ধরে নিচ্ছি) আপনি যদি পশ্চিমা জগতে বসবাস করেন আপনার ছেলেমেয়েরা যারা এদেশে বড় হচ্ছে তাদের আচরণে আপনি অনেকটা একই আচরণ দেখতে

পাবেন। আপনার সন্তানরা ইসলামী শিক্ষা দীক্ষায় বড় হচ্ছে নাকি হিন্দু ধর্ম মতে কিংবা পুরো ধর্মের ছোঁয়ার বাইরে অবস্থান করছে সেটা বড় কথা নয়। তাদের সবারই ব্যাবহারিক জীবনে, তাদের আচার আচরণে আপনি ধৈর্য্য দেখতে পাবেন, অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখবেন।

(২) বর্তমান বিশ্বের সমস্যাসমূহের জন্য আসলে দায়ী কারা ঃ

আজকের বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায় বেশীর ভাগ সমস্যা মুসলিম দেশসমূহে কিংবা মুসলমানদেরকে নিয়ে। ফিলিস্তিন, কাশ্মির, বসনিয়া, কসভো, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান সবগুলোই তো মুসলিম দেশ কিংবা অমুসলিম দেশ কিন্তু সমস্যাটা মুসলমানদেরকে নিয়ে। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনার আগে সম্মানিত পাঠকদেরকে আমি একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই যে, যে ঘটনা বা দুর্ঘটনা মূল কারণ বা সুত্রপাত বের করা খুবই প্রয়োজন। বের করা প্রয়োজন দুর্ঘটনার পেছনে কি কার্যকারন রয়েছে।আসুন প্রথমেই উপমহাদেশের সমস্যা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। তার আগে আমি পাঠকদেরকে অনুরোধ করবো একটা ম্যাপ নিয়ে পুরো উপমহাদেশের চিত্রটা একনজর দেখে নিতে, সম্ভব হলে ম্যাপটা চোখের সামনে রাখুন। লক্ষ্য করুন, কত আঁকা বাঁকা আমাদের উপমহাদেশের এই মানচিত্র। বাংলাদেশের মানচিত্রটাই একটু ভালভাবে নজর দিয়ে দেখুন। ভারত, পাকিস্তান এবং কাশ্মিরের মানচিত্রটার প্রতি একটু নজর দিন। দেখুন কত আঁকা বাঁকা। এবার আসুন নজর দিন ইউরোপের মানচিত্রের দিকে, আমেরিকার মানচিত্রের দিকে। দেখুন কত সোজা করে ভাগ করা। অথচ আমাদের মানচিত্রটা কত জটিল। আপনি কি কখনো এটা নিয়ে ভেবে দেখেছেন। আমাদের দেশ ভাগ বা মানচিত্রটা কাদের দ্বারা প্রণিত? শুধু তাই নয় আমার আজও বুঝে আসেনা ১৯৪৭ সালে যখন ভারত উপমহাদেশ ব্রিটিশ থেকে স্বাধীনতা লাভ করলো তখন কোন যুক্তিতে তৎকালীন পূব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশকে) পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করা হলো, যদিও পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের ভাষা ভিন্ন, সংস্কৃতি ভিন্ন, ভৌগলিকভাবে হাজার হাজার মাইল দূরে। পক্ষান্তরে পশ্চিম বংগের কিছু এরিয়া যাদের ভাষা বাংলা, যারা ধর্মে মুসলমান, যাদের সংস্কৃতি প্রায় বাংলাদেশীদের মতই সেই এরিয়াগুলোকে কেন বাংলাদেশের সাথে দেয়া হয়নি। তেমনিভাবে ভারতের আসাম এবং বাংলাদেশের সিলেট জেলা; ধর্ম, ভাষা এবং সংস্কৃতির দিক থেকে আসাম এবং সিলেট খুবই কাছাকাছি অথচ ভারত এবং বাংলাদেশে বিভক্ত। কাশ্মিরের অর্ধেক রাখা হয়েছে পাকিস্তানের সাথে বাকি অর্ধেক ভারতের সাথে। এতে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে মূলতঃ উপমহাদেশের সমস্যাগুলোর কার্যকারণ ঐসমস্ত ইতিহাসের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। কাশ্মিরের বেশির ভাগ অধিবাসীরা ছিল মুসলমান, ভাগ যেহেতু করা হয়েছেই দ্বিজাতি তত্বের ভিত্তিতে কাশ্মিরকে কেন ভারতের সাথে দেয়া হলো।

ফিলিস্তিনিরা ১৯৪৭ সাল থেকে স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন করছে অর্ধ শতাধিক বছর ধরে, কাশ্মিরীরা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করছে অর্ধশতাধিক বছর ধরে এরা স্বাধীনতা তো পাচ্ছেই না বরং সংজ্ঞায়িত হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে। অপরদিকে ইন্দোনেশীয়ার ইস্ট তিমুর দ্বীপে পুর্তুগীজরা বাইরে থেকে এসে বসতি স্থাপন করে তারপর ইস্ট তিমুর বাসীরা ১৯৭৫ সালে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে ২৫ বছরে তারা তাদের স্বাধীনতা পেয়ে যায়। ফিলিস্তিনি, কাশ্মিরি আর ইস্ট তীমুরবাসী এরা সবাই মানুষ, সবাই তাদের অধিকার এবং স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে। ইস্ট তিমুর বাসীরা স্বাধীনতা পেয়ে যায় ফিলিস্তিনিরা আর কাশ্মিরীরা পায় না, পার্থক্যটা এখানে, ফিলিস্তিনিরা আর কাশ্মিরীরা মুসলমান আর ইস্ট তিমুরবাসীরা খৃষ্টান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বসনিয়াকে সার্বিয়ার সাথে যুক্ত করা হয় কোন যুক্তিতে? বসনিয়ানরা তাদের নিজস্ব জাতীয় স্বকীয়তা, পরিচয় এবং মুসলমান হিসেবে বাঁচতে চায়। নেমে আসে বসনিয়ানদের উপর ঐতিহাসিক বর্বরতা তারপরও মুসলমানদেরকে সংজ্ঞায়িত করা হয় সন্ত্রাসী হিসেবে। তেমনিভাবে ঐতিহাসিক নিষ্ঠুরতা চলে কসোভোর মুসলমানদের উপর তাদের একমাত্র অপরাধ তারা নিজেদের পরিচয় এবং স্বকীয়তা নিয়ে বাঁচতে চায়। নিষ্ঠুরতা চলে জেনিনে ও মুসলমানদের উপর। কি অপরাধ ছিল ভারতের গুজরাটের মুসলমানদের ?! তারা তো তাদের স্বাধীনতাটাও চায়নি তারপরও কেন তাদেরকে পুড়িয়ে মারা হলো। এরাও তো মানুষ, পশুকেও তো কেউ এভাবে হত্যা করতে পারেনা। কোথায় সেই বিশ্ববিবেক, কোথায় সেই বুদ্ধিজীবিরা। কি অপরাধ ছিল গুজরাটের মুসলমানদের। অপরাধ ছিল তো একটাই যে তারা মুসলমান। পরে তো এটা প্রমাণিত হলো যে এই বর্বর পৈশাচিক কর্মকান্ড ছিল রাজ্য সরকারসহ একটি কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্র। এরপরও বলা হচ্ছে মুসলমানরা সন্ত্রাসী।

কি অপরাধ ছিল আফগানিস্তানের নিরীহ মানুষের? দোষ করেছে বিন লাদেন, কিন্তু শাস্তি হলো কার?! কোথায় সেই বিন লাদেন? বিন লাদেনের তো কোন বিচার হয়নি?! বিন লাদেন কি কি অন্যায় করেছে সেসব তো উদঘাটন করা হলোনা। কারা কারা বিন লাদেনের সাথে আছে, ষড়যন্ত্রের সাথে আর কারা জড়িত তাতো বের হলো না। কি অপরাধ ছিল আফগানিস্তানের মানুষের। খেলা সাঙ হলো কেন? তালেবানের অপরাধ ছিল তালেবান বিন লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়নি। তারা বলেছিল, বিন লাদেন যে অপরাধী তারা তার

প্রমাণ চায় তবেই তারা বিন লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে দেবে। শেষ পর্য্যন্ত বিন লাদেন তার নিজের অবস্থাতেই থাকলো। তার সম্ভবত কিছুই হয়নি, কোন বিচার তো হয়ইনি। স্বভাবতই মনে হচ্ছে বিন লাদেন দিব্যি বেচে আছে। শাস্তি পেল আফগানিস্তানের নিরীহ মানুষ।

উপসংহারঃ

না, ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের কোনই সম্পর্ক নাই। ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইতিহাস সাক্ষী মুসলমানরা নির্যাতিত হয়েছে অনেক বেশী।

মানতে হবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহের মানুষের মধ্যে অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে। অজ্ঞতা, অশিক্ষা, দূরদর্শিতার অভাব, আবেগপ্রবণতা, ক্রোধ ইত্যাদি। তবে বুঝতে হবে যে, সমস্যাগুলো ভৌগলিক। একজন কাশ্মিরী কিংবা ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যদি তার পিতা-মাতা আত্মীয় স্বজন হারিয়ে ক্রোধের বশবতী হয়ে প্রতিশোধস্পৃহ হয়ে পড়ে নিঃসন্দেহে সে ব্যাক্তিকে ফিলিস্তিনি বা কাশ্মিরী হিসেবে দেখতে হবে। মানুষের মধ্যে দোষ গুন দুটোই থাকে। কোন দোষকেই গড়পড়তা মুসলমানদের দোষ বলে চিত্রায়িত করা হবে অন্যায়। ভৌগলিক অবস্থানভেদে একেক দেশে একেক রকম সমস্যা রয়েছে। তেমনিভাবে দোষ এবং গুণ রয়েছে ইউরোকেন্দ্রিক দেশগুলোতে। ইউরোকেন্দ্রিক যে কোন কিছুই ভাল, সাদা মানে ভাল এমন মানষিকতা ঠিক নয়। মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রায়িত করার পেছনে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমগুলোর বাড়াবাড়ি রয়েছে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যম যারা নিয়ন্ত্রন করছেন তাদের কেউ কেউ ইসলাম সম্পর্কে ভূল ধারনার বশবর্তী হয়ে আছেন।

(লেখক, আবুসাইদ মাহফুজ বাংলাদেশের ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৮৭ সালে কামিল হাদিস, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি,এ এবং এম, এ, মালয়েশীয়াস্থ ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে এম, এ এবং যুক্তরাস্ট্রেও ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার ইনফরমেশন সিস্টেমে এম, এ। বর্তমানে তিনি ইউনিভার্সিটি অফ ডেট্রয়েট মার্সিতে ডাটা ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। লেখকের ই-মেইল mahfuzab@udmercy.edu)